আধুনিক বাংলা উপন্যাস ঃ কিছু শ্রেনীবিভাগ, কিছু উদাহরন

শান্তিসুধা মুখোপাধ্যায়

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রমথ চৌধুরী ভাবিষ্যৎবানী করেছিলেন যে বাংলাভাষায় উপন্যাসশাখার খুব একটা উন্নতি হবে না, কারন বাঙালীর দৈনন্দিন জীবন বড়ই একঘেয়ে। সেখানে না আছে কোনো কঠোর জীবনসংগ্রাম, না আছে ব াইরের জগত থেকে আসা কোনো বড় চ্যালেঞ্জ। অপর পক্ষে ছোটগল্পের পক্ষে এমন উপযোগী জীবনভূমি আর হয় না। ছোট প্রাণ ছোটব্যথা, ছোট ছোট দুঃখকথা নিয়েই তো আমরা আছি।

আজ শতাব্দীশেষে প্রমথ চৌধুরীর কথাটা ভাবলে মনে হয় তাঁর ভবিষ্যদ্বানী ফলল না। এর কারন আমাদের জাতীয় জীবনের অক্ষরেখাটা যেদিকে ঘোরবার কথা ছিল সেদিকে না ঘুরে তার বিপরীত দিকেই ঘুরেছে। বিংশ শতাব্দীরমাঝাম াঝি আসতে না আসতেই বাঙালীর জীবনে বাইরের পৃথিবী হৈ হৈ করে ঢুকে পড়ল। তার জীবন সংগ্রাম তীব্রতর হল, সার্থক উপন্যাস রচিত হবার জন্য যে বৃহৎ জীবনপটভূমি দরকার তা দেখতে দেখতে তৈরি হয়ে গেল। আজকের বাংল াভাষায় উপন্যাসই সবচেয়ে সমৃদ্ধ সাহিত্যশাখা।

--- আধুনিক কাকে বলে ---
আধুনিকতা কথাটা আপেক্ষিক। মহাকালের ধারা নিরবচ্ছিন্ন। প্রতি যুগই কতকাংশে পূর্বযুগের অনুবৃত্তি এবং কতক াংশে পরবর্তীর পূর্বাভাস। সেইজন্য আধুনিকতার সীমানির্দেশ করা যায় না। তবে গানিতিক স্পষ্টতায় সংজ্ঞা না দেওয় া গেলেও আধুনিকতার একটা ভাবগত নির্দেশ সম্ভব। নদীর উপমা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সেটা বুঝিয়েছিলেন। নদী যেমনচলতে চলতে মাঝে মাঝে একটা করে বড় বাঁক নেয় মানুষের ভাবজগত সেইরকম মাঝে মাঝে তার গতিপথে বড়বঁ াক নিয়ে অন্যদিকে ঘুরে যায়। শেষ বাঁকটি থেকে সমসাময়িক কাল পর্যন্ত আধুনিকতার সীমানা ধরা যেতে পারে।
তদনুসারে বর্তমান রচনায় ভারতের স্বাধীনতা লাভের সময় থেকে সমসাময়িক কাল পর্যন্ত আধুনিক যুগ ধরা হবে।
--- প্রাককথন ---
বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস বেশিদিনের নয়। এর সূচনা হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে। তাঁর প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫) থেকে শেষ উপন্যাস সীতারাম (১৮৮৬) পর্যন্ত পুরো উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে তিনি সম্রাটের মত বিরাজ করেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর মূল্যবোধ ও বার্তা মূর্ত হয়েছিল তাঁর রচনায়।

বাংলা উপন্যাসের পরবর্তী মাইলস্টোন রবীন্দ্রনাথ। অল্প বয়সে বঙ্কিমি ধাঁচের দুটি উপন্যাস তিনি লিখেছিলেন বটে,অচিরেই তিনি বুঝতে পারেন যে তাঁর পথ আলাদা। পরে ১৯০৩ থেকে ১৯১০ এর মধ্যে তিনি চোখের বালি, নৌকাডুবি ও গোরা এই তিনটি উপন্যাস লেখেন। আপাতদৃষ্টিতে এগুলি সমসাময়িক বাঙ্গালী জীবনের পটভূমিতে স্থা পিত সামাজিক গল্প। কিন্তু এরই মধ্যে স্তরে স্তরে নিহিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব জীবনবীক্ষা। সমাজের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, এবং দ্বিধাবিভক্ত মানবাত্মার অভ্যন্তরে সত্তার এর অংশের সঙ্গে অপর অংশের সম্পর্ক তিনি সন্ধান করেছিলেন।

কয়েক বছর বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ আবার উপন্যাসের হাত দিলেন। এবারের লেখা অন্য ধারার। ১৯১৬ থেকে ১৯৩৭ পযন্ত সেগুলি লেখা হয়। দু একটি ছাড়া এই পর্বের লেখাগুলি সবই আয়তনে অপেক্ষাকৃত ছোট। অভ্যন্তরীন বিচারে তারা ঘনবদ্ধ (Compact)। ভাষা ও আঙ্গিকে রয়েছে ইঙ্গিতধর্মিতার প্রাধান্য এবং নানা প্রীক্ষানিরীক্ষা।বিষয়বৈচিত্র্য ও বিপুল। কোথাও আছে প্রেমমনস্তত্বের বিশ্লেষন (শেষের কবিতা, দুই বোন, মালঞ্চ) কোথাও অসম দাম্পত্যের ট্রাজেডি (যোগাযোগ), কোথাও আধ্যাত্মিক আত্মানুসন্ধান (চতুরঙ্গ), কোথাও বা সমসাময়িক স্বাধীনতা আন্দোলনের তাৎপর্য বিচার (ঘরে বাইরে, চার অধ্যায়)। এই সব রচনায় রাবীন্দ্রিক প্রশান্তির চিহ্নমাত্র নেই। বরং বজ্রগর্ভ মেঘের মত একটা চাপা টেনশন এগুলির তলায় তলায় বয়ে চলেছে।
রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের এই উপন্যাসগুলি প্রচলিত অর্থে জনপ্রিয় নয়। কারন জীবনের মৌলিক সমস্যা সম্পর্কে কিছুটা অন্তর্দৃষ্টি না থাকলে এদের বোঝা যায় না।

যে সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ পর্বের উপন্যাসগুলি লিখছিলেন সেই কালসীমার মধ্যেই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রবেশ ও প্রস্থান। আজ পর্যন্ত তিনি বাংলা সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় উপন্যাসিক । এই অসামান্য জনপ্রিয়তার চাবিকাঠি নিহিত অছে তাঁর রচনার সহজ সরল মানবিক আবেদনের মধ্যে।
এই তিন প্রধান উপন্যাসিক বাংলা উপন্যাসের প্রাথমিক যুগকে ধারন করে আছেন। এঁরা চরিত্রধর্মে সম্পূর্ণ আলাদা , কিন্তু মিল হল এঁরা সকলেই উনবিংশ শতাব্দীর ফসল।

বিশ শতকে অনেক লেখক এসে গেলেন। তাঁদের রচনায় ভাবজগতের নানা পরস্পর বিরোধী হওয়া বইতেসু করল। এই সব অসংখ্য লেখকের মধ্যে উপন্যাস সাহিত্যে যুগপ্রতিনিধি হিসাবে যদি দু একজনকে বেছে নিতে চাই তাহলে নাম করতে হয় তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের --- বিভূতিভূষন, তারাশঙ্কর ও মানিক। ১৯২৭ - ২৯ নাগাদ এঁরাতিনজনেই বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করেন। সারা পৃথিবীতে তখন একটা প্রতিষ্ঠানবিরোধিতার হাওয়া বইছে। পুরনোমূল্যবোধ থেকে সরে এসে জগৎ ও জীবনের নতুনতর ব্যাখ্যা খুঁজছেন ভাবুকেরা। সেই পরিপ্রেক্ষিতে এঁরাও ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে নিজের মত করে জীবনকে দেখেছেন। এঁদের পরস্পরের মধ্যে সমুদ্রসমান ব্যবধান, যদিও এঁরা এক দেশে এক কালে বর্তমান ছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর সূচনাকাল থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সমাপ্তি পর্যন্ত ভারতীয় জীবনের আর্থসামাজিক বিন্যাস কি ভাবে পালটে যাচ্ছে এবং বাংলার গ্রামীন জীবনে কিভাবে তা প্রতিফলিত হচ্ছে তার অন্তদৃষ্টিপুর্ন বিশ্লেষন আছেতারাশঙ্করের রচনায়। নিঃশব্দ বিপ্লবের তিনি অদ্বিতীয় রূপকার। ফ্রয়োড়িয় মনোবিকলন পদ্ধতিতে সমসাময়িক সমাজে মানুষজনকে তন্ন তন্ন, করে দেখেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর বিভূতিভূষনের জগতে যাবতীয় দ্বন্দ্ব বিক্ষোভ মৃত্যু অপমানকে সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েও তাকে অতিত্রম করে যাবার প্রশান্তি ব্যাপ্ত হয়ে আছে।

--- আধুনিক যুগ সূচনা ---
একালের ইতিহাসে প্রথম ও দ্বিতীয় এই দুই মহাযুদ্ধ মানবসভ্যতাকে যে ভাবে নাড়া দিয়ে গেছে এমন বোধহয় আরকোনো ঘটনাই নয়। তবু প্রথম মহাযুদ্ধে ইউরোপ যতখানি বিচলিত হয়েছিল আমরা তেমনটা হই নি। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বেলায় ঘটনাটা তা হল না। প্রায় সূচনাকাল থেকেই তার উত্তপ্ত নিশ্বাস আমাদের ঘাড়ের ওপর অনুভব করা গিয়েছিল। দ্রব্যমূল্যমান হু হু করে এমন বাড়তে লাগল যে দৈনন্দিন সংসারযাত্রা চালানো হয়ে উঠল উত্তরোত্তর কঠিন। নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু হল দুর্মূল্য। ত্রমে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে বাঙ্গালার গ্রামগুলি উৎসন্ন হয়ে শহরের পথে পথে শু হল মৃত্যুর মিছিল। শোনা যায় ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে এখানে দশ লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিল। জাপানীবোমার আতঙ্কে শহরবাসী পালাল গ্রামে। রেঙ্গুনে জাপানী আত্রমনের ফলে ব্রহ্মদেশের প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালীরা শরনার্থী হয়ে ভিটে মাটি ছেড়ে চলে এল ভারতে। যুদ্ধ শেষ হল যখন, যখন ইউরোপের স্বাধীন দেশগুলিতে ধবংসস্তূপ সরিয়ে ঘর গোছানোর প

ালা শু হচ্ছে, তখন আমাদের এই দুর্ভাগা পরাধীন দেশে লাগল হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা। (১৯৪৬ এর বাঙ্গলায় যে গৃহযুদ্ধ বেঁধেছিল তা আমাদের কাছে সাগরপারের মহাযুদ্ধের চেয়েও অনেক বেশি ভয়াবহ, ঢের বেশি বাস্তব। পুষ ানুক্রমে যারা পরস্পরকে প্রতিবেশি বলে জেনেছে এক অশুভ প্রভাতে জেগে উঠে তারা দেখল যে তারা একে অপরের শত্রু ও ঘাতক। আমাদের রক্তের ভিতরে এই মারীর বীজ বহুদিন ধরেই লুকনো ছিল,নয়ত এমন সর্বাত্মক বিস্ফোরন ঘটল কি করে। উন্মত্ততা তার চরম সীমায় পৌঁছবার পর অবশেষে এল দেশভাগ ও স্বাধীনতা। স্বাধীনতার মর্ম ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যা ছিল বাঙ্গলায় তা ছিল না। বঙ্গভূমির বৃহত্তর অংশ হঠাৎ এক রাত্রিশেষে দেখল তারা ভারতীয় নয়। লক্ষ লক্ষ শরনার্থীর বিপুল চাপ সহ্য করার ক্ষমতা আগে থেকেই পূর্নভারাক্রান্ত হীনবল পশ্চিমবঙ্গের ছিল না। পাঞ্জ াবের শরনার্থীরা যেভাবে বাস্তব অবস্থাকে মেনে নিয়ে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং অবশেষে পুণর্বাসিত হতে পেরেছিল নানা কারনে বাঙ্গালীরা তা ও পারে নি। কিছুটা তাদের প্রকৃতিগত দৌর্বল্য, কিছুটা সরকারী ঔদাসীন্য এবং কিছুটা রাজনৈতিক উস্কানিতে তার বছরের পর বছর শরনার্থী শিবিরে পড়ে রইল সু সময়ের আশায়। সমাজজীবনে এর ফল হল সুদূরপ্রসারী। বাঁধ ভেঙে হু হু করে নদীর জল ঢুকেপড়লে লোকালয়ের যে অবস্থা হয় । বেঁচে থাকবার দায়ে নীতিধর্ম হল উপেক্ষিত। যে কোনো প্রকারে শুধু মাত্র বেঁচেথাকবার দায়ে স্ত্রী পুষ নির্বিশেষে পথে নামল। সমাজের যেসব ধ্যান ধারনা নিয়ে এতকাল শৌখিন তর্কবিতর্ক চলত, দেখা গেল প্রয়োজনের ঝোড়ো হাওয়ার সে মূল্যবোধগুলি উড়ে যাচ্ছে। এরই মধ্যে দুযোগসন্ধানীরা অনেকেইহঠাৎ করে রাতারাতি ধনবান হয়ে গেল। যারা আগে ছিল ভদ্র মধ্যবিত্ত প্রতিযোগিতায় হেরে তারা কোথায় যে হারিয়ে গেল কে জানে। স্বাধীনতার আগে আমাদের সমাজে যে শ্রেনীবিন্যাস ছিল তা আর রইল না।

এই অস্থির আলোড়ন চলল বেশ কিছুকাল ধরে। তারপর আস্তে আস্তে সবই থিতিয়ে এল এবং তখন দেখা গেল বাঙ্গ ালী অনেক দুঃখের মূল্যে শিখেছে জীবনার্থ অনুসন্ধান কাকে বলে। প্রকৃত উপন্যাস সৃষ্টির অনুকূল সময় তখন তৈরি হল।

অসংখ্য লেখকের নানারকম উপন্যাসে এই কালক্ষেত্রটি পরিপূর্ন। বর্তমান সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে সেকালের সব লেখকেরপরিচয় দেওয়া যাবে না। এমন কি অনেক উল্লেখযোগ্য লেখক ও গ্রন্থের নামত্ত বাদ যেতে পারে। এখানে শুধু তাঁদেরকথাই বলা হবে যাঁরা কোন না কোন দিকদিয়ে বাংলা সাহিত্যে একটি নতুন ধারা তৈরি করেছেন, এবং যাঁদের প্রদর্শিত পথে উত্তরসূরীরা হেঁটেছেন । আরও একটি কথা মনে রাখা দরকার যে একালে বাংলা উপন্যাসের প্রকৃতি হয়ে গেছে জটিল ও বহুস্তরবিশিষ্ট আগেকার মত সামাজিক, ঐতিহাসিক, মনস্তাত্বিক এইরকম দু চারটি মোটা দাগের শ্রে নিবিভাগ দিয়ে তাদের চরিত্র নির্দেশ করা যাবে না। বরং ভালো লেখাগুলিতে সমাজ, মনস্তত্ব, রাজনীতি, দর্শন সব মিলিয়ে জীবনের সমগ্রতাকেই ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে। সেইজন্য সমালোচনার নিয়মে যদিও কয়েকটি শ্রেনীনির্দেশ অ ামরা করব, তবুও একথা সত্য যে অনেক লেখাই সেই শ্রেনীর বাইরে নিজের অবয়ব বিস্তার করে রেখেছে।

--- সাহিত্যে আঞ্চলিকতার স্বাদ ---

স্বাধীনতা উত্তর বাংলা উপন্যাসের একটা বড় প্রবনতা হল তার ভৌগোলিক সীমানার বিস্তার। ইতিপূর্বে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলমে এর সূচনা হয়েছিল। এখন স্বাধীনতার অল্পকাল পরেই এই শ্রেনীর একটি অসাধারন রচনা দেখা দিল। বইটির নাম ঢোঁড়াই চরিত মানস। লেখক সতীনাথ ভাদুড়ি।

উপন্যাসের ঘটনা কাল প্রাক্ স্বাধীনতা যুগের। ঘটনাস্থল বিহার, সেখানকার ছোট গ্রাম জিরানিয়া, তার তাৎমাটুলি অন্ত্যজের পাড়া। সে পারার অনাথ ছেলে ঢোঁড়াই এ গল্পের নায়ক। তার বিধবা মা তাকে গ্রাম্য দেবতার থানে এক বে াবা সন্ন্যাসীর কাছে দিয়ে এসেছিল। ধুলো কাদায় পড়ে থেকে ভিক্ষার অন্নে সে পালকপিতার কাছে বড় হল। বড়হয়ে সে কিন্তু আর ভিক্ষাকে জীবিকা হিসাবে স্বীকার করল না। পঞ্চ (পঞ্চায়েত) এর কঠোর অনুশাসন উপেক্ষা করে সে স্ব

বসমাজের বাইরে আরম্ভ করল মেলামেশা। ধাঙড়দের সঙ্গে জুটে লাগল পাক্কি (পাকা রাস্তা) তৈরির কাজে। এই পাক্কি তার কাছে বাইরের জগতের প্রতীক । কত গাড়ি যায়, কোথা থেকে আসে, কোথায় যায় কে জানে। পাক্কিতে মালবাহী গর গাড়ি চালাবার জীবিকা গ্রহন করে বিয়ে থা করে সে যখন বেশ গুছিয়ে বসেছে সেই সময় স্ত্রীর অপ্রত্যাশিত বিশ্বাসঘাতকতা তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল পরিচিত সীমানার বাইরে। রাগে দুঃখে ঘরবাড়ি ছেড়ে নিদ্দেশ ঢোঁড়াই শেষ পর্যন্ত গিয়ে ঠেকল বিসকান্দা গ্রামে । কয়েক বছর পরের জমিতে মজুর খাটার পর ঘটনাচক্রে তাকে গিয়ে ঠেকতে দেখি গান্ধীবাদী ভলন্টিয়ার দের দলে। সেটা গান্ধীজীর অসহযোগ অন্দোলনের কাল। চরিত্রগুনে ঢোঁড়াই সেখানে একদিন ছোটখাট একটা নেতা হয়েও সে জীবন ত্যাগ করল। রাজনীতির ভেতর যে দলাদলি ও কূটনৈতিক আপোষরফা চলে সেখানে তার মন বসল না। তার পুরনো গ্রাম তাৎমাটুলিতে সে শিকড়ের সন্ধানে ফিরেছিল। ফিরে দেখল তার শিকড় কিছু নেই। ভারতবর্ষের সেই চিরন্তন অনিকেত একাকী মানুষটি আবার পথে পা দিল। কোথায় গেল কে জানে।

এই সহজ গল্পটিকে মাঝখানে রেখে সতীনাথ তার ধারে ধারে লৌকিক আবহের এক বিচিত্র জাল বুনেছেন। রামচরিতমানসের আদলে বইয়ের নাম দিয়েছেন ঢোঁড়াই চরিত মানস। ভারতীয় জনমানসে রামকথার এটা গভীর প্রভাব আছে। বিশেষত উত্তর ভারতে তুলসিদাসের রামচরিতমানস একটা যুগের আধ্যাত্মিক ধ্যানধারনাকে সমগ্রভাবে ধরে রেখেছিল। তেমনি করে বিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রহরে তুচ্ছাতিতুচ্ছ কোনো গ্রামের দরিদ্র অন্ত্যজ, অশিক্ষিত অনাথ এক মানুষের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের মর্মকথা তিনি ভরে দেবেন এই ছিল লেখকের পরিকল্পনা । ছোট ছোট পরিচ্ছদের শিরোনামে রামায়নের পরিচ্ছেদবিভাগের ভাষা ব্যবহার করে বিবৃতি ও সংলাপ উভয়ত জিরানিয়ার স্থানীয় বুলি অবিরল ছড়িয়ে ছিটিয়ে তৎকালীন বিহারী গ্রামাঞ্চলকে তিনি জীবন্ত করে তুলেছেন।

আর একটি উল্লেখযোগ্য বইয়ের বিষয়ে দু চার কথা বলা যাক। বইটির নাম গঙ্গা, লেখক সমরেশ বসু, লেখক হিসাবে তিনি চিরজীবী হয়ে থাকবেন কিনা সে বিচার মহাকালের হাতে, তবে এ কথা ঠিক যে আধুনিক বাংলা উপন্যাসসাহিত্যের অনেকগুলি প্রবণতা তাঁর মধ্যে মূর্ত হয়েছিল। বর্তমান নিবন্ধে এঁর নাম আমাদের আরও কয়েকবার করতে হবে। সমরেশ বসুর জন্ম হয়েছিল বর্তমান বাংলাদেশে কিন্তু বাল্যকালেই তিনি চলে এসেছিলেন পশ্চিমবঙ্গেরশিল্পনগরী নৈহাটিতে। কলকাতা থেকে তিরিশ কিলোমিটার দূরের এই ধরনের মফঃস্বল শহরগুলির নিজস্ব কোনো চরিত্র নেই। এখানে না আছে নগরের আভিজাত্য, না আছে গ্রামের শান্তি। অথচ গ্রামের সংকীর্নতা ও নগরের ক্লেদদুটিই আছে পুরোপুরি। তার ওপর নৈহাটিতে অজস্র কলকারখানা থাকার ফলে নানা প্রদেশের মানুষের বস্তিএবংসার্বিক অপরিচ্ছন্নতা খুব বেশি। এখানকার বিশাল রেল ইয়ার্ড সমাজবিরোধীদের মুক্ত বিচরনক্ষেত্র। এই দেশেজন্মসূত্রে মধ্যবিত্ত, কিন্তু ঘটনাচক্রে প্রায় শ্রমিক নিম্নবিত্ত হয়ে সমরেশের যৌবন শু হয়। কলেজ পরীক্ষা পাশ করে সাধারন চাকরি বাকবির বাঁধা পথে যে ভাবে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ছেলের জীবন শু হয় তাঁর বেলায় সেটা হয়ে ওঠে নি।অতি অল্প বয়সে বিয়ে করে স্ত্রী পুত্রসহ শ্রমিক বস্তির ঘরে ভয়াবহ দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁকে বেশ কিছুকালকাটাতে হয়েছে। তখন বাঁচবার তাগিদে সব রকম কাজই করেছেন এবং সেভাবেই মধ্যবিত্ত জীবনের চেনা ছকের বাইরে জীবনের কটুতিক্ত কষায় সবরকম স্বাদই পেয়েছেন, এরই মধ্যে যুক্ত হয়েছেন সেকালের বামপন্থী রাজনীতিতে। এরই মধ্যে একটু একটু করে লালন করে তুলেছেন নিজের ভেতরকার গূঢ় শিল্পী সত্তাটিকে।

গঙ্গা তাঁর প্রথম দিককার বই। তখন তিনি সবে মাত্র পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে অনেক সাধনার পর এ বই তিনি লিখেছিলেন। গঙ্গার কূলেই নৈহাটি । তিনি দেখতেন প্রতি বছর বর্ষা নামবার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিনবঙ্গ থেকে জেলেরা দলে দলে নৌকা নিয়ে উত্তরে গঙ্গার উজানে চলে আসে মিষ্টি জলের মাছ ধরতে। মাছের আবির্ভাব কিন্তু অনিশ্চিত। কবে মাছেরা দল বেঁধে আসবে, বিপুল নদীর ঠিক কোন অঞ্চলটায় তারা থাকবে কেউ জানে না। সতর্ক দৃষ্টি ফেলে প্রতীক্ষারত জেলেরা ঘুরে বেড়ায়। এরি মধ্যে তাদের মহাজনের দেনা মেটাতে হয়, মালিককে নৌকোর ভাড়া গুনতে হয়, নিজেদের পেটের খিদে সামাল দিতে হয়, বাড়ীতে বৌ ছেলেপুলের অন্নসংস্থান করতে হয়, কোনো

কর্তব্যকেই বাদ দিলে চলে না। অভাবে, অনিশ্চয়তায়, ক্ষিপ্ত হয়ে কখনো কখনো তারা নিজেদের মধ্যেই ঝগড়া করে। শেষপর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে ভাবে হয়তো এবারের মত মাছের আশা ছেড়ে দিতে হল। ঠিক সেইসময় হয়ত হঠাৎ একদিন অ াকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামে। দেবতার আর্শীবাদের মত মীনেরা (মাছেরা) সদলবলে তাদের জালে ধরা দেয়। শু হয় অন্য প ালা। এই মাছমারাদের (জেলেদের) মধ্যেই যারা ডাকাবুকো তারা দূর সমুদ্রেও মাছ ধরতে চলে যায়। তাদের জীবনে এটাই সবচেয়ে বড় অ্যাডভেঞ্চার । সুন্দবনের খাঁড়িপথে শরীরের শিরা উপশিরার মত হাজার হাজার নদী। সেখানে কিলবিল করছে কুমির আর সাপ, আর ডাঙায় ওত পেতে বসে আছে সুন্দবনের বাঘ, সাক্ষাৎ মৃত্যু।

গঙ্গার নায়ক বিলাসের বাবা ছিল জেলেদের সাইদার (দলপতি)। জোয়ান বয়সে সে বেঘোরে মারা গেছে। এখন ত ারছেলে বিলাস বড় হয়েছে। বাপের মতই সে সাহসী আর শক্তিশালী। তার নিরীহ ভালোমানুষ কাকা পাঁচু তাকে দেখে আর শঙ্কিত হয়ে নানাভাবে চেষ্টা করে তার প্রানপ্রাচুর্যকে দমিয়ে রাখতে। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যেন বলে দেয়ে এ ছেলে ঘরে থাকবে না। শেষ পর্যন্ত বিলাস থাকেও না। গঙ্গার বুকে পাঁচুর মৃত্যু হয়। বীর্যের মূল্যে প্রেমময়ী প্রানপূর্না একনারীকে জয় করেও বিলাস পাড়ি দেয় সমুদ্রের দিকে। রক্তে তার বৃহত্তর জগতের আহ্বান কল্লোলিত হতে থাকে।

উপন্যাসটি আকারে বড় নয়। কিন্তু খুব যত্ন করে লেখা। শোনা যায় এই বই লেখবার আগে সমরেশ বসু কিছুদিন জেলেদের সঙ্গে নৌকায় বাস করেছিলেন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য। তাই মাছমারাদের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, সংস্কার, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, ভাষা সবই সরাসরি জীবন থেকে উঠে এসেছে উপন্যাসের পাতায়। প্রানের নদী ও জলের নদীকে একাকার করা বাস্তব জীবনভিত্তিক এই উপন্যাসে লোকায়ত জীবনের স্বাদগন্ধ পাওয়া যায়।

তৃতীয় যে উপন্যাসটির কথা এই বিভাগে আলোচনা করব সেটি একেবারে হাল আমলের। লেখক দেবেশ রায়, বই তিস্তাপারের বৃত্তান্ত। বৃত্তান্ত - এই নিতান্ত গদ্যগন্ধী শব্দটি দিয়ে লেখক যেন আগেভাগেই পাঠককে বলে দিচ্ছেন কে ানরকম মধুর উপকথার আশা না করতে। সহস্রাধিক পৃষ্ঠা এই বিশাল গ্রন্থে নরনারীপ্রেমের চিহ্নমাত্র নেই। নারীচরিত্রই বিশেষ নেই। আছে তিস্তা তোর্সা ডায়না নদীর অববাহিকা স্থিত জনপদের পুঙ্খানুপুঙ্খ আর্থসামাজিক বৃত্তান্ত। যদিও এই বই একাদেমি পুরস্কার পেয়েছে, এবং এরই অংশ অবলম্বনে চেতনা নাট্যগোষ্ঠী অনবদ্য নাটক তৈরি করেছেন, তবুওউপন্যাস হিসাবে এটি জনপ্রিয় নয়, হবার কথাও নয়। তার আনেকগুলো কারন আছে। প্রথমত এর মধ্যে অবিরল ব্যবহৃত হয়েছে উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক ভাষা, যার অনুবাদ হয় না, অথচ যা বাদ দিলে উপন্যাসের সত্যতা অনেকখানি চাপা পড়ে । দ্বিতীয়ত এ উপন্যাসে নারীচরিত্র নেই, এবং স্নেহ, প্রেম, পারিবারিক সম্পর্ক ইত্যাদির সম্পূর্ন অনুপস্থিত উত্তরবঙ্গের অর্থনীতি, সমাজনীতি রাজনীতির যে চুলচেরা বিচার আছে তা গড়পড়তা পাঠকের বোধের ব াইরে । তবু এ উপন্যাসকে উপেক্ষা করা যায় না।

তিস্তা উত্তরবঙ্গের একটি ছোট নদী। কিন্তু অতি ভয়ঙ্কর নদী। সে জলের নদী নয়, ফেনার নদী। তার অববাহিকার অংশবিশেষ এই উপন্যাসের ঘটনাস্থল। উত্তরে আপলচাঁদ রিজার্ভ ফরেষ্ট। দক্ষিনে জলপাইগুড়ি শহর। স্বাধীনতার পরে এখানে জনকল্যানমূলক যে সব প্রকল্প হয়েছে তার সুফল কিন্তু সমাজের সর্বস্তরে ছড়াতে পারে নি। উপকারের সিংহ ভাগটুকু আত্মসাৎ করেছে কয়েক জন বুদ্ধিমান সুবিধাশিকারী লোক। গয়ানাথ জোতদার ঠিক সেইরকম একজন। তার সঙ্গে শত্রুতা মিত্রতার বিচিত্র সম্পর্কে বাঁধা আছে আরও অনেকে। তাদের কৌশলে রামের ধন শ্যাম পায়। সরকা রি সম্পত্তি নয়ছয় হয়। সরকারী সদুদ্দেশ্য মাঝপথে দিকভ্রষ্ট হয়ে এদের পকেটে ভরে। এদেরই বিপ্রতীপে লেখক স্থাপন করেছেন বাঘা নামের এক জন্মদাস রাখানিয়া মানসি কে। তার মা ছিল গয়নাথের ঐরকমের দাসী। বাঘা পিতৃপরিচয়হীন সন্তান, জন্ম থেকেই গয়ানাথের সম্পত্তি। তার গায়ে বন্য জন্তর মত শক্তি, এবং মস্তিষ্কে বন্য জন্তুর মতই বুদ্ধিহীনতা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়ের বোধ এবং অবোধ ও অন্ধ আজ্ঞাপালন এইটুকু মাত্র নিয়ে তার অস্তিত্ব।নাম জিজ্ঞেস করলে সে বলে মোর নাম নাই রো (আমার নাম নেই) কারন একদা নাম বলে সে মহা ফ্যাসাদে পড়েছিল। এই ন

ামহীন, বোধহীন, অধিকারচেতনাহীন প্রানীটির মধ্যে মূর্ত হয়েছে সভ্যতার প্রসাদবঞ্চিত মূঢ় মূক শাশ্বতভারতবর্ষ।

গয়ানাথের আদেশে বাঘা ভোট দেয় , তার পার্টির মিছিলে ঝান্ডা বয়, এমেলিয়া (এম এল এ) কে পিঠে তুলে সাঁতরে নদী পার করে। বানের জলে উপড়ে পড়া ফরেস্টের গাছের ওপর বসে নদীর জলে ভেসে চলে যায় শুধু এইজন্য যাতে গয়ানাথ পরে গাছগুলি আপন সম্পত্তি বলে দখল করতে পারে। গাছপালা পশুপক্ষীর যে গভীর জীবনানন্দ সেই অ ানন্দেই বাঁচে, জানেনা যে সভ্যতার হাতে মার খাওয়াই তার নিয়তি।

--- ইতিহাসের নবনির্মান ---
আধুনিক উপন্যাসের আর একটি শক্তিশালী ধারা হল ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসের। আগেকার দিনের ঐতিহাসিক রোম ান্সগুলির সঙ্গে এদের তফাত আছে। সেগুলির মত এই রচনাগুলি কোনো ঐতিহাসিক বীরপুরষের গৌরবগাথা নয়। সে ধরনের সমুন্নতি বা জাঁকজমকত্ত এদের লক্ষ্য নয়। এখানে কোন একটা বিশেষ ঐতিহাসিক কালখন্ডকে বিষয়বস্তু হিসাবে লেখকেরা বেছে নিচ্ছেন। তার মধ্যে বাস্তব ও কাল্পনিক সব রকম চরিত্ররাই থাকছে।ঘটনাও। সব মিলিয়ে অবশেষে উঠে আসছে সে কালের অন্যতর ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা।

স্বাধীনতা উত্তর কলে এই শ্রেনীর প্রথম যে উপন্যাসটি খুব বিখ্যাত হয়েছিল তা বিমল মিত্রের সাহেবের বিবি গোলাম। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের কলকাতা শহর এর পটভূমি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দৌলতে তখন এক শ্রেনীরমানুষ বিনা পরিশ্রমে প্রচুর টাকার মালিক হয়ে কলকাতা শহরে ভোগেসুখে বসবাস করতেন। মদ্যপান, বারাঙ্গনা বিলাস এবং অ ারো হাজারো বদখেয়ালে টাকা উড়িয়ে দু তিন পুষের মধ্যে তাঁরা পথের ভিখারী হতেন। এঁদের জীবনযাপন প্রনালীর ন াম ছিল বাবু কালচার। বিমল মিত্র তাঁর উপন্যাসে এইরকমের কোনও পরিবারে সম্পুর্ন বিপরীতজগৎ থেকে এক গরিব সহৃদয় গ্রাম্য যুবককে আশ্রিত হিসাবে নিয়ে এসেছেন এবং তারই চোখ দিয়ে তৎকালীন শহর কলকাতার বিচিত্রমুখী ক ালচারের ছবি এঁকেছেন।

বইটি নিয়ে এককালে বিতর্ক ছিল। কেউ কেউ বলেছিলেন লেখক শুধু বড়ঘরের কেচ্ছার কথাই লিখেছেন। ইতিহাসের এ ব্যাখ্যা একদেশদর্শী । আবার ইন্দিরা দেবীর মত মননশীল ব্যক্তি সত্য উদ্‌ঘাটনের সাহস দেখাবার জন্য লেখককে অভিনন্দিত করেছিলেন। আজকে বেশ কয়েক দশক কেটে যাবার পর স্বীকার করতেই হয় যে সাহেব বিবি গোলাম শিল্পকর্ম হিসাবে একেবারে প্রথম শ্রেনীর না হলেও পরবর্তী বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে একটা পথ খুলে দেবার জন্য চিরস্মরনীয় হবে থাকবে। এর সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে বাংলা ভাষায় অনুরূপ রচনার বান ডাকল। স্বয়ং বিমল মিত্রই বেগম মেরি বিশ্বাস, একক দশক শতক প্রভৃতি লিখলেন। পরে এলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ আরও অনেকে। বিশেষ করে উনবিংশ শতাব্দীকে নানা দৃষ্টিকোন থেকে আবিষ্কার ও ব্যাখ্যা করবার একটা হওয়া উঠে গেল।
খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে স্বাধীনতা উত্তর কালের বাঙ্গালী ঔপন্যাসিকেরা গল্প খুঁজতে অগ্রজদের মত আর মোগলর াজপুত মারাঠা ইতিহাসে প্রবেশ করলেন না অধিকাংশই ইংরাজ আগমন পরবর্তী সমাজবিবর্তনের কাহিনীতেই আকৃষ্ট হলেন বেশি।

উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ নিয়ে প্রমথনাথ বিশির একটি উল্লেখযোগ্য বই আছে। কেরি সাহেবের মুনসি। এখানে র াজনৈতিক ইতিহাস ততটা নেই যতটা আছে তৎকালীন সংস্কৃতির রূপরেখা। এ উপন্যাসের নায়ক বাংলা গদ্যেরপ্রথম লেখক রামরাম বসু। তিনি ছিলেন উইয়িলম কেরির মুনসি। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে যুগপৎ শ্রীরামপুর মিশনের অধ্যক্ষ এবং ফোর্ট উউলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ হয়ে কেরি ভারতইতিহাসে প্রবেশ করেন। সাগর পার হয়ে তিনি এদেশে এসেছিলেন খৃষ্টধর্ম প্রচারক হিসাবে, কিন্তু কার্যত তিনি তার চেয়ে অনেক বড় ভূমিকা পালন করে গেছেন। তিনি চিরস্মরনীয় হয়ে আছেন প্রাচ্যভাষাবিদরূপে। বাংলা গদ্যের সূচনাকার রূপে । এক সাধুস্বভাব জ্ঞানতপস্বী রূপে। র

ামরাম বসু যুগপৎ তাঁর কর্মচারী, শিক্ষক ও পরামর্শদাতা ছিলেন। শিয়ালের মত চতুর প্রখরবাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন, এবং ততোধিক সুযোগসন্ধানী এই লোকটির চোখ দিয়ে লেখক সেকালের নবাগত সাহেব সম্প্রদায়কে দেখিয়েছেন। বইটির সুর লঘু। কৌতুকের একটা অন্ত শীল প্রবাহ, যা প্রমথনাথ বিশির স্বভাব বৈশিষ্ট্য , এই
গ্রন্থের তলায় তলায় বইছে। অথচ বইটি হাসির নয়, বরং ক্ষেত্রবিশেষে ট্রাজিক। হাসিকান্না মেশানো স্বাদে এবং বিষয়বস্তুর মৌলিকতায় বইটি স্মরনীয়।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধ নিয়ে সাহেব বিবি গোলামের চেয়েও পূর্নাঙ্গ একটি উপন্যাস লিখেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। --- সেই সময়। অবশ্য তাঁর প্রথম আলো বইটিরও একই পটভুমি। দেখা যাচ্ছে বাঙ্গালীর মনে উনবিংশ শতকের এই দ্বিতীয়ার্ধটি নানা কারনে বড় গভীর প্রভার বিস্তার করে রেখেছে। যাই হোক প্রকাশকালের দিক থেকে এগিয়ে বলে প্রথম আলোর পরিবর্তে সেই সময় এর কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া যাক।

অনেক বইপত্র পড়ে অনেক পরিশ্রম করে এই বই লেখা হয়েছিল। অনেক নামজাদা মানুষকে তিনি এখানে এনেছেন। তঁাদের ইতিহাস সবই জানা। সেইজন্য লেখক সতর্ক থেকে ছেন। তথ্যগত কোনো বড় ভুল খুঁতখুঁতে সমালোচকও এখানে পাবেন না। তাই সেই সময় এর ঐতিহাসিক মূল্যও কম নয় । এই বাস্তব ঐতিহাসিক পরিবেশের মধ্যে লেখক নায়ক হিসাবে যাকে এনেছেন সে কাল্পনিক চরিত্র। যদিও তার আকৃতি প্রকৃতি ও কার্যকলাপের সঙ্গে সেকালের এক যুগপুষ কালিপ্রসন্ন সিংহের প্রায় অক্ষরে অক্ষরে মিল দেখা যায় তবুও লেখক সে নাম ও পরিচয় ব্যবহার করেন নি একটা বিশেয় কারনে।

কলকাতার এক মহাধনী ব্যবসায়ী পরিবারে নায়ক নবীনকুমারের জন্ম হয়েছিল। তার প্রকৃত জনক ছিল এক অতি তীক্ষ্নধী প্রখর ব্যক্তিত্বশালী ব্রাহ্মণ পন্ডিত। আমরা যাকে উনবিংশ শতকের রেনেসাঁস বলি তাও কি প্রকারান্তরে একটি সংকর সংকৃতি নয় ? ইংরেজ প্রদত্ত শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে সেকালেও কি মিশিয়ে ছিল না প্রাচীন হিন্দু ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পুনর্জ্জীবন ? যাই হোক কালক্রমে নবীনকুমারের মধ্যে এই দুই উত্তরাধিকারের দোষ ও গুনগুলি পুরোমাত্রায় বিকশিত হয়েছিল। সে ছিল মেধাবী, দানশীল, উদার, প্রতিভাবান ও প্রগতিশীল, আবার সেই সঙ্গেই জেদি, অহংকারী, আত্মপরায়ন ও মদ্যপ। তার তিরিশ বছরের জীবনকাল আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক পরম মাহেন্দ্রক্ষণ। অনেক বড় বড় ঘটনা তখন ঘটেছে এবং নবীনকুমার তাদের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছে। আবার সেই একই কালে অন্ধকারাচ্ছন্ন গ্রামবাংলায় চলেছে চূড়ান্ত শোষন ও নৈরাজ্য। অলোকপ্রাপ্ত শিক্ষিতের সঙ্গে এই অকিঞ্চন ভারবর্ষেরকোনও যোগই ছিল না। রেনেসাঁসের ফল যে খুব বেশী সুদূর প্রসারী হল না সে কি এইজন্য যে তার বার্তা সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে পৌঁছয় নি ? সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব এইখানে যে তিনি এখানে সামগ্রিকভাবে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, গ্রাম ও শহর সব মিলিয়ে সেই সময়ের পূর্নাঙ্গ চিত্র ও ব্যাখ্যা দিতে পেরেছেন।

এই শ্রেনীভুক্ত উপন্যাসের উদাহরন আর না বাড়িয়ে শেষে ভিন্ন স্বাদের এক ঐতিহাসিক উপন্যাসের উল্লেখ করি।
বইটির নাম মৈত্রেয় জাতক, লেখিকা বানী বসু। যখন মগধে রাজত্ব করছেন বিম্বিসার এবং গৌতম সবেমাত্র বুদ্ধত্ব লাভ করে লোকালয়ে ধর্মপ্রচার করছেন এটা সেই কালের কাহিনী। তথাগতের জীবন নিয়ে বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বেও নানারকম গল্প কবিতা লেখা হয়েছে। কিন্তু সেগুলিতে আবেগ ও কল্পনার ভূমিকা যত বড় ছিল ইতিহাস সচেতনতা ততখানি ছিল না। বানী বসু সেকালের রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে যথাসম্ভব উদ্ধার করতেচেষ্টা করেছেন এবং সে ইতিহাসের একটা নিজস্ব ব্যাখ্যাও দিয়েছেন, গ্রন্থভূমিকায় তিনি নিজেই জানিয়েছেন যে বৌদ্ধধর্মের তত্ব অংশ নিয়ে তিনি বিশেষ আগ্রহী নন। তাঁর আগ্রহ মানুষ সিদ্ধার্থের বিষয়ে। -- "বিগ্রহের ভিতরকার মানুষ অমিতাভ কেমন, কী তার তাৎপর্য তা দেখার বিশেষ আগ্রহ ছিল। আরও আগ্রহের বিষয় সেই দেশ ও সেই কাল যা তাঁকে সম্ভব করেছিল, সেইসব মানুষ যাঁরা তাঁকে বন্ধুতা অথবা শত্রুতা দিয়েছিলেন, এবং সবার পেছনে সেই জীবনের পটভূমি যা

সাধারনজনের যাপিত।”

--- রাজনৈতিক উপন্যাস ---

আধুনিক বাংলা উপন্যাসের একটা বড় শাখার বিষয়বস্তু হল রাজনীতি। রাজনীতিপরায়ন জাতি বলে ভারতে বাঙালীর খ্যাতি (বা অখ্যাতি) আছে, এবং সেই আনন্দমঠের কাল থেকেই বাংলাভাষায় রাজনৈতিক উপন্যাস লেখা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে ও চার অধ্যায়, শরৎচন্দ্রের পথের দাবি, তারাশঙ্করের ধাত্রীদেবতা প্রাক্ স্বাধীনতা যুগের উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক উপন্যাস। তবু সূক্ষ্মভাবে দেখলে সেকালের সঙ্গে এ কালের রাজনৈতিক উপন্যাসেরএকটা বড় তফাত চোখে না পড়েই পারে না। রবীন্দ্রনাথের বাদে সেকালের অন্য সব রাজনৈতিক উপন্যাসেই আবেগও আদর্শবাদিতার উচচকণ্ঠ সুরটি শোনা যেত। পরাধীন জাতির মানসিকতায় সেটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু স্বাধীনতার পরে লেখা রাজনৈতিক উপন্যাস গুলিতে মোহভঙ্গজনিত তিক্ততা আর লুকনো থাকে নি। আবেগের স্থানে এসেছে বিশ্লেষন ও বিচার। অনেক লেখকের ভিড় থেকে তিনজন লেখকের তিনটি ভিন্নধারার মৌলিক রচনাকে আমরা আলোচনার জন্য বেছে নেব। লেখকরা হচেছন সমরেশ বসু, মহাশ্বেতা দেবী ও গৌরকিশোর ঘোষ। এঁদের তিন জনের মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে যে এঁরা সকলেই জীবনের একটা পর্বে সক্রিয় রাজনীতি অথবা সমাজসেবার সঙ্গে জড়িত হয়েছিলেন, সকলেই নিজ নিজ অভিজ্ঞতার প্রতিষ্ঠাভূমিতে দাঁড়িয়ে কথা বলেছেন বলে এঁদের রচনায় একটা গভীর সততা আছে।

প্রথমে আসা যাক সমরেশ বসুর কথায়। প্রথম যৌবনে ইনি কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় কর্মী ছিলেন। ১৯৪৮ - ৪৯ সালে পার্টি নিষিদ্ধ হলে তিনি কারাদ্ধ হন। এর অব্যবহিত কালে তাঁর জীবনে এমন কিছু কিছু ঘটনা ঘটে যাতে তিনি উপলব্ধি করতে থাকেন যে পার্টির শাসনযন্ত্র ও মানুষের জাগ্রত বিবেক অনেক সময়ের বিপরীত পথে চলে। পার্টির অভ্যন্তরীন শৃঙ্খলার ছুতোয় মতলববাজ নেতারা অনেক সময়েই উঠতি সৎ কর্মীকে চেপে দেন। এমনকি হত্যাও করেন। এইরকম বিষয় নিয়ে সমরেশ বসু অনেকগুলো কাহিনী লিখেছিলেন। স্বীকারোক্তি নামের ছোটগল্পটির কথা এ প্রসঙ্গে পাঠকের মনে পড়বেই। এ গল্পে থানার গোপন ঘরে অত্যাচারের গন্ধ মাখা গা ছম ছম করা পরিবেশে একজন রাজনৈতিক বন্দীর স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা করছেন সুচতুর এক অফিসার। জেরার ফাঁদে পড়ে নানা কথা বলতে বলতে বন্দী অনুভব করছে পৃথিবীতে কে কার কাছে স্বীকারোক্তি দেবে তার কি কোন ঠিক ঠিকানা আছে ? সহকমী, প্রেমিকযুগল , স্বামী স্ত্রী সবাই পরস্পরের কাছে সত্য গোপন করছে। তারা প্রত্যেকে পরস্পরকে পেছন থেকে ছুরি মারার চেষ্টা করেছে। এই তো সংসার এই তো রাজনীতি।

উপন্যাসে সমরেশ বসু আরও গভীরে ঢুকেছেন, শুনিয়েছেন মানুষের আত্মানুসন্ধানের কাহিনী। তিন পুষ, শিকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে, যুগ যুগ জীয়ে প্রভৃতি রাজনৈতিক উপন্যাসের মধ্য থেকে পরিবেশের অভিনবত্বের কারনে শিকল ছেঁড়ে হাতের খোঁজে নামক বইটিকে নেওয়া যাক। নায়ক নাওয়াল আগারিয়া সাতপুষে লোহাকাটা শ্রমিক।কোনো এক দূর কালে , যখন শ্রমিক সংগঠন বস্তুটি কারও কল্পনাতেই ছিল না, তখনই মালিকের অন্যায় আদেশেরপ্রতিবাদ করে, এবং প্রতিকার করে তার বাবা লছমন আগারিয়া শ্রমিকনেতা বনে গিয়েছিল। সে ছিল স্বত স্ফূর্ত নেতা। তার ছিল দুর্জয় সাহস। ছেলে নাওয়ালের রক্তে তারই উত্তরাধিকার । ভারত স্বাধীন হলে প্রথম যখন শ্রমিকরা ইউনিয়ন গড়ল তখন সেইজন্য নাওয়ালই হল তাদের অবিসংবাদিত নেতা।

নাওয়ালের মধ্যে সম্ভাবনা দেখতে পান রাজনৈতিক নেতারা। তাঁরা একে এম পি বানান। পার্টি পলিটিক্স ভদ্রলোকের রাজনীতি। সেখানে সত্যিকারের শ্রমিকেরা বেমানান। শুধু হাতে কলমে কাজ করা সত্যিকারের শ্রমিক হয়েও যেনাওয়াল এম পি হয়ে পার্লামেন্টের ঠান্ডা ঘরে গিয়ে বসল তাতেই তাকে নিয়ে এল প্রচারের কড়া অলোয়। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহে তার সঙ্গে ছবি তুললেন, পার্টি ডেলিগেশনে সে রাশিয়া ঘুরে এল, তার দৈনন্দিনঅভ্যাস বদলে গেল,

নিজস্ব যে শেকড়টুকু তার স্বদেশে ছিল তা কেটে গেল, তার অশিক্ষিত গরিব শ্রমিক আত্মীয়স্বজন তাকে পর ভাবতে ল াগল, আর তাকে শোপিস হিসাবে ব্যবহার করতে লাগল তার পার্টি। নাওয়ালের মধ্যে পুষানুত্রমে পাওয়া যে অ াগুনটুকু ছিল তা নিভে গেল। নাওয়াল নষ্ট হয়ে গেল। কল্পনার স্বর্গে বছর দশেক বাস করবার পর নাওয়ালের হল পতন। সে ভোটে হারল, পার্টি তাকে আবার টিকিট দিতে অস্বীকার করল, পার্টির নেতারাতাকে উপেক্ষা করে, আবার শ্রমিকবাবুরা অবিশ্বাস করে। দশ বছর পরে চোখ খুলে নাওয়াল দেখল এ জগতেতার কোনও নিজস্ব জায়গা নেই। লেখক মনে করেন তার ওপর আরোপিত পরিচয় টা ছিল তার শেকল। সেটা ছিঁড়বার পর এবার তার জীবনে হয়ত শু হবে আত্মানুসন্ধানের নতুন অধ্যায়।
এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে লেখক আমাদের দেশে শ্রমিক রাজনীতির অন্ধিসন্ধি দেখিয়েছেন। সত্যিকারের শ্রমিকস্বার্থের সঙ্গে এ রাজনীতির উদ্দেশ্য যে মিলছে না একথা তিনি গোপন করেন নি।

এবার আসি অন্য আর এক রকম রাজনীতির গল্পে। সে গল্প নকসাল রাজনীতির। ষাটের দশকের শেষ থেকে সত্তর দশকের প্রথম কয়েক বছর পর্যন্ত এক অতি উগ্র বামপন্থী আন্দোলন আমাদের দেশকে অধিকার করেছিল, উত্তরবঙ্গে নকশালবাড়িতে কৃষক আন্দোলন দিয়ে এর সূচনা হয়েছিল বলে একে নকশাল আন্দোলন বলা হয়। এ আন্দোলনে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা দলে দলে সামিল হয়েছিল অথচ প্রাপ্তবয়স্ক বিজ্ঞ লোক বিশেষ যায় নি, অনেক মেধাবী ছ াত্র তাদের নিশ্চিত জীবন ও জীবিকা ছেড়ে কেন যে হঠাৎ বহিমুখী পতঙ্গের মত হত্যা ও ধবংসের রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, কেন বা তাদের পোকামাকড়ের মত নির্বিচারে ও নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল, এবং কেনই বা তখন দেশের তথাকথিত বিবেকবান বুদ্ধিজীবী ও নেতারা তার প্রতিবাদ করেন নি তা আমরা জানি না, সে যুগের সত্য ইতিহ াস এখনো লেখা হয় নি। কেবল কোনো লেখক তাঁদের গল্প উপন্যাসে সেই অপচিত যৌবনের কাহিনী বর্ননা করেছেন। তাও অনেক পরে। এ ক্ষেত্রে সমরেশ বসু, সমরেশ মজুমদার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতিদের নাম করা যায় । এই শ্রে নীর যে রচনাটির আলাদা উল্লেখ করব সেটি মহাশ্বেতা দেবীর হাজার চুরাশির মা।উপন্যাসটি ছোট এবং গঠনকৌশল মৌলিক। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী নকশাল আন্দোলনে নিহতদের সংখ্যাবলা হয়েছিল এক হাজার চুরাশি জন (যদিও প্রকৃত সংখ্যা তার অনেক বেশি)। তাদের তালিকার শেষে যে ছেলেটির নাম আছে ঘটনার বেশ কিছুদিন পরে ত াদের বাড়িতে এক উৎসবের আয়োজন হয়েছে। দৈবত্রমে সেটাই ছেলেটির মৃত্যুদিন। জীবন দাঁড়িয়ে থাকে না। শোক চিরস্থায়ী নয় - এই কারনে অন্যান্য আত্মীয়স্বজন এই মৃত্যুদিনেরকথা স্মরণ করে বিচলিত নয় কিন্তু তার মার পক্ষে এই ঔদাসীন্য তো সম্ভব নয়। অথচ তাকেও লোকসমাজে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করতে হচ্ছে। চেষ্টা করতে গিয়ে সে দেখছে সাদরে নিমন্ত্রতদের মধ্যে রয়েছে তার ছেলের ঘাতকেরা। মায়ের ছিন্নভিন্ন আত্মার মধ্য দিয়ে পথ করে নিয়ে লেখক অ ামাদের এক সংশয়ময় সময়ের সামনে দাঁড় করিয়ে দেন।

--- বিচ্ছিন্নতা বোধ ---
আধুনিক বাংলা উপন্যাসের এই ধারাটি অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ। এ ধারাকে নিছক বিচ্ছিন্নতাবোধের সংজ্ঞায় সীমাবদ্ধ করা যায় কিনা বলা শক্ত। আসলে এখানে লেখকেরা কোন না কোন একাকী অনিকেত নায়কের অন্তরলোকে প্রবেশকরে সেখ ানকার অবস্থার একটা যথাসম্ভব সত্যচিত্র দিতে চেয়েছেন। পাশ্চাত্যে আলবেয়ার কামু, বা জাঁ পল সার্ত্র যে ধরনের ক্ষনিকবাদ (Existentialism) তাঁদের উপন্যাসে দেখিয়েছিলেন তার সঙ্গে এই উপন্যাসগুলির মিল আছে। বিবর উপন্যাসে সমরেশ বসু এই রীতির সূচনা করেন। উপন্যাসের নায়ক চরম বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত এক অস্বাভাবিক যুবক। । সমাজের মধ্যেই সে বাস করে। সামাজিক পরিচয়েই চিহ্নিত হয়। সে লেখাপড়া জানা চাকরি বাকরি করা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ মানুষ। অথচ তার মনের মধ্যে বাসা বেঁধে আছে আবেগহীন, অনুভূতিহীন ধর্মাধর্মবোধহীন এক প্রানী। (ইতিপূর্বে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিবারাত্রির কাব্যে এই রকমের একটি চরিত্র দেখা গিয়েছিল)। উপন্যাসের প্রধান ঘটনা এই নায়কের দ্বারা তার সঙ্গমসঙ্গিনী নীতার হত্যা। এই হত্যার কোনো সঙ্গত পূর্বভূমিকা নেই, এবং প্রত্যাশিত প্রতিত্রিয়াও নেই।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ঘুনপোকাও একই ধারার রচনা। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আত্মপ্রকাশ নামধেয় উপন্যাসেও ত াই। এখানকার কুশীলবেরা কলকাতা শহরের লেখাপড়া জানা চাকরিবাকরি করা তথাকথিত ভালো ছেলে । তাদের প্র ায় সকলেরই স্বাভাবিকপারিবারিক জীবন আছে। তবু তারা কেন যে মাঝে মাঝে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে যায়, ড্রাগ সহ খারাপ নেশা করে, বাড়ি থেকেউধাও হয়, অদ্ভুত জায়গায় গিয়ে নানা অদ্ভুত কাজ করে, আবার নেশা কেটে গেলে হৃদয়ভার ঝেড়ে ফেলে সুস্থস্বাভাবিক ভদ্রলোক হয়ে বাড়ি ফিরে আসে লেখক তা গভীরে ঢুকে দেখান নি বটে, তবে এদের উদ্‌ভ্র ান্তচিত্ততা খুব বিশ্বাসযোগ্য করেই এঁকেছেন।

--- জীবন যে রকম ---

আর একটি মাত্র শ্রেনীর কথা বলে বর্তমান আলোচনা শেষ করব। সাম্প্রতিককালে বাংলা সাহিত্যে অনেক শাখাপ্রশাখ াযুক্ত একধরনের উপন্যাস দেখা দিয়েছে । এখনও পর্যন্ত এ শ্রেনীতে গৌরবজনক সাফল্য পেয়েছেন একজনই - শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় । তাঁর দূরবীন, মানবজমিন, যাওপাখি, পার্থিব প্রভৃতি এই ধরনের উপন্যাস। টেলিভিশনের সোপ অপের ার সঙ্গে এগুলির তুলনা করা যায়। সোপ অপেরার মত এদের গড়ন এবং জনপ্রিয়তাও যথেষ্ট। সোপ অপেরা কথাটি নিন্দার্থে ব্যবহৃত হয়েছে বলে যেন কেউ মনে না করেন, কারন বইগুলি মোটেই নিন্দনীয় নয়। অসংখ্য শাখাপ্রশাখা এদের বৈশিষ্ট্য এবং এই শাখাগুলির যে কোনও একটি নিয়েই স্বয়ংসম্পূর্ন ছোটগল্প বা উপন্যাস হতে পারে। কোন একটা সূত্র অবলম্বন করে সমাজের নানা স্তরের নানারকম মানুষের জীবনকাহিনীতে লেখক ঘুরে বেড়ান, যেন বলতে চ ান - দেখ, জীবন কত বিচিত্র। যেমন পার্থিব উপন্যাসটি গ্রামের এক গরিব বুড়ো বিষুঞ্চরনের মৃত্যুচিন্তা দিয়ে শু হল। ত ারপর লেখক একে একে বিষুঞ্চরনের ছেলেমেয়ে, যারা সকলেই প্রাপ্তবয়স্ক এবং নানা দিকে ছড়িয়ে পড়া, তাদের গল্পগুলি বলতে থাকলেন এবং এই সূত্রে ঘুরে বেড়ালেন সমাজের নানা স্তরের নানা মানসিকতার লোকজনের সঙ্গে । যেমন বিষুঞ্চরনের বড় ছেলে মস্ত বড় পরিবেশ বিজ্ঞানী কৃষঞ্জীবনের যে জীবনবৃত্ত তার থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত মেতে থ াকে তারই যাত্রাভিনেত্রী বোন বীনাপানি। হতদরিদ্র প্রতিবন্ধী গৃহশিক্ষক আর বিপুলবিত্ত খামখেয়ালি যুবা তাদের জগৎ আলাদা। উচ্চশিক্ষিত অতিরূপবতী কেরিয়ারিস্ট নারী আর অবোধ প্রেমমুগ্ধকিশোরী ভিন্ন পথের পথিক। এই উপন্য াসের বৃহৎ সমাজে সকলেরই নিজ নিজ স্থান আছে। প্রত্যেকের গল্পেরই কোন না কোন উপসংহার আছে, যদিও সব উপসংহার মিলনান্তক নয়। শেষে পাঠকের এই ধরনের একটি ধারনা হয় যে জীবন তো এইরকমই।

--- উপসংহার ---

এতক্ষন বাংলা উপন্যাসের যে আলোচনা করা হল বলা বাহুল্য সেটাই শেষ কথা নয়। তাছাড়া মূল্যায়ন ও শ্রেনীবিভ াগের পদ্ধতি নিয়েও মতভেদ থাকতেই পারে । বর্তমান প্রবন্ধে শুধু একটা সাধারন পরেখা নির্দেশের চেষ্টা হয়েছে মাত্র। যে সব লেখক এবং লেখার উল্লেখ হয়েছে সেগুলি ছাড়াও অনেক লেখক আছেন. অনেক রচনাও আছে যা উল্লেখে যে াগ্য । যে উপন্যাসগুলি আলাদা করে আলোচিত হয়েছে সেগুলিই যে একালের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস এমনও মনে করার ক ারন নেই। আমি শুধু সেই রচনাগুলিরই উল্লেখ করেছি যারা নতুন কোনো পথ খুলে দিতে পেরেছেন পরবর্তী লেখকদের জন্য।

বাঙ্গালী আজ একটা সংকটময় অবস্থার মধ্য দিয়ে চলেছে। বঙ্গভাষী যে ভূখণ্ড থেকে বাঙ্গলা সাহিত্য একদিন উঠে এসেছিল তারা অর্ধাংশ আজ অন্য রাষ্ট্র। সেখানে বাঙ্গলা ভাষা এ সাহিত্যের আর একটা সমান্তরাল ধারা বইছে যার আলোচনা এ নিবন্ধেকরা যায় নি, কারন সে ধারা এখনো নির্মীয়মান এবং তার পুরো খবর এদেশের সব পাঠক জানে ন া। তা ছাড়া পৃথিবীর সব দেশেই মনে হয় উপন্যাস পড়বার লোক কমে আসছে। বিশেষত ঃ বহু- সমস্যাভারক্রান্ত পশ্চি মবঙ্গে তো বটেই। অথচ লেখকরা যখন কিছু সৃষ্টি করেন তখন জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে তাঁদের মনের মধ্যে বসে থ াকে আদর্শ পাঠকের একটি ভাবমূর্তি। ভালো পাঠক না পেলে গভীর রসের মহৎ উপন্যাস লেখকেরালিখবেন কার মুখ

চেয়ে! বইমেলার ভিড় দেখে সাহিত্যের প্রকৃত অবস্থা অনুমান করা যায় না। নতুন প্রজন্মের পাঠক কতখানি আগ্রহ নিয়ে সিরিয়াস বাংলা বই পড়ছে তাই দিয়ে বিচার হবে ভবিষ্যৎ কালের পাঠক চরিত্রের । আজকের দিনের বাংলা বইএর পড়ুয়াদের দিকে তাকিয়ে তাই মাঝে মাঝে সংশয় হয় আমাদের উপন্যাসের এই ঐর্যময় উত্তরাধিকার আমরা বহন করে চলতে পারব তো?